*Pratidhwani the Echo*
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.177-186*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# ক্রীড়া সাংবাদিকতার আলোকে মতি নন্দী

**আরনা মুখোপাধ্যায়**
*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

***Abstract:***
*Because to sports journalism, Moti Nandi was able to connect the world of sports to the realm of literature. This journalistic entity never raised issues with literary beings. The game was first introduced to newspaper readers by Moti Nandi. For this reason, he will always be remembered as a legend in Bengali sports journalism. The prose throughout the game's pages is quick-witted and subtly sophisticated. Everything that was previously written on the game page is only statistics and descriptions. Somehow, a description of one or two goals, or a nonstop account of how many runs a player scored, would appear on the last page of the newspaper. Because of the caliber of his writing, the author was able to recognize that the game might become well-known among readers. Moti laid the groundwork for life even before he became a sports journalist and author.*

**Keyword- Sports journalism, Moti Nandi, Uponyas, Life Struggle**

**আলোচনা:** মতি নন্দী নামটির সঙ্গে ক্রীড়া শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তিনি যেমন পরিচিত উপন্যাসিক ও গল্পকাররূপে, তেমনি তার নামে প্রাধান্য পায় ক্রীড়া সাংবাদিকতার দিকটিও।মতি নন্দী তার নিজস্ব স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন '১৯৪৮-এ স্কটিশ চার্চ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, তারপর বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আইএসসি পাস করা। তারপর পড়া টেকনিক্যাল স্কুলে। অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা শেষ করে স্টেট ট্রান্সপোর্ট বেলঘরিয়া ডিপোয় আনপেইড অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে কাজ শুরু করি।'[১] সংশয়জাগে টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বেলঘরিয়া ডিপোর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন যে সাহিত্যের বা সাংবাদিকতার সেতু তা মিলিত হল কিভাবে? টেকনিক্যাল জীবনের চৌহদ্দির বাইরে বেরিয়ে আসতে তাকে খুব বেশি ক্রোশ অতিক্রম করতে হয়নি, কারণ পরবর্তীযুগে সাহিত্যিকতা বা সাংবাদিকতা ছিল মতি নন্দীর ভালো লাগার জায়গা। মেকানিক্যাল দিক, যদিও পূর্বভাবনায় তিনি জানাচ্ছেন ক্রীড়া সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চা ছিল তার ধরাছোঁয়ার বাইরে- অকল্পনীয় একটি দিক। তার ছেলেবেলার কালে আজকের মতো ছিল না বিনোদনের অজস্র মাধ্যম সেইসময় বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল খেলা, পাশাপাশি লাইব্রেরী, সিনেমা বা রেডিও উল্লেখ্য। ব্যক্তিগত জীবনে খেলাধুলার প্রতি প্রবল আকর্ষণ হেতু তিনি ছিলেন প্রায় প্রতিটি খেলার ম্যাচের দর্শক। 'আমি মোহনবাগাণ সাপোর্টার। র‍্যামপার্টের ভিড়ে দাঁড়িয়ে মোহনবাগানের খেলা দেখতাম।'[২]

নিয়মিত সাহিত্যচর্চা শুরু হয় শিবশম্ভু পাল, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে, সাহিত্যচর্চা আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় বেলঘরিয়া ডিপোর বেগার খাটুনি থেকে মুক্তির আশায়। মতি নন্দীর লেখা প্রথম গল্প

'ছাদ' প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৬৩ তে। উল্টোরথ পত্রিকায় আয়োজিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি উপলক্ষ্যে মতি রচিত প্রথম উপন্যাস 'ধুলোবালির মাটি' যেমন বিচারকদের মনকে জয় করে সেরা হয়ে ওঠে, আকর্ষিত হয় পাঠককূল, গতি পায় 'চোরা ঢেউ' 'বেহুলার ভেলা' র মতো রচনারা, গতিময় সাহিত্যিকের সাহিত্যের গতি বাঁক পরিবর্তন করে ক্রীড়া সাংবাদিকতার খাতিরে, 'যুগান্তর' পত্রিকাগোষ্ঠী ১৩৬৮-র ২৯শে বৈশাখ থেকে 'অমৃত' পত্রিকার প্রকাশ শুরু করে, উক্ত পত্রিকায় ১৩৬৮ পৌষ সংখ্যায় গল্পকার মতি নন্দীর প্রথম ক্রীড়া বিষয়ক ছোটগল্প 'শূণ্যে অন্তরীণ' প্রকাশিত হয়, যা রীতিমত আকৃষ্ট করে সন্তোষকুমার ঘোষকে। তিনি ছিলেন তৎকালীন বার্তা সম্পাদক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' র। দোলাচল মতি জীবনে স্থায়ী জীবিকা হাতছানি দেয় সন্তোষবাবুর সান্নিধ্যে, অনায়াসে গ্রহণ করেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' র লেখার প্রস্তাবকে।'এক-একটা লেখার জন্য পেতাম পণেরো টাকা। প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্যই আমাকে প্রচুর খাটতে হতো'।[৩] ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে আয়োজিত ভারতীয় ক্রিকেট বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর, উক্ত সফরে এক ভয়ংকর ঘটনা ঘটে। ভারতীয় অধিনায়ক নরি কন্ট্রাক্টার গুরুতর আহত হণ চার্লি গ্রিফিথের বাউন্সারের বল মাথায় লাগার ফলে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রেক্ষিত যাচাই করার তাগিদে সন্তোষকুমার ঘোষ মতি নন্দীকে পাঠান পঙ্কজ রায়ের কাছে, ঘটে যাওয়া ঘটনার বিস্তারিত বিবরণীর খোঁজে। পঙ্কজ রায়ের দেওয়া বিবরণী অগোচরে প্রস্তুত করে ক্রীড়াকেন্দ্রিক পাতার নতুনত্বকে ফিরে গিয়ে একটা ছোট লেখা লিখে ফেলেন মতি নন্দী। সাহিত্যিকের ক্রীড়া সাংবাদিকতায় শুরু সেই ছোট লেখা হতে। পঙ্কজ রায়ের তার কুমারটুলির বাড়িতে মতিকে দেওয়া সময়সাপেক্ষ সাক্ষাৎকারের মধ্যে নিছক সাক্ষাৎকারের প্রাধান্য ছিল না। পঙ্কজ রায় ব্যাট হাতে নানা ভঙ্গিতে নবাগত সাংবাদিককে বোঝালেন শট পিচ বল কতটা উঠতে পারে, আবার নাও উঠতে পারে। ফিরে এসে মতি নন্দী সাক্ষাৎকারদাতার বোঝানোর প্রেক্ষিতে একটা লেখা লিখে ফেললেন, পথ চলা শুরু হল ক্রীড়া সাংবাদিকতার। আর একটা ঘটনা তার সাংবাদিকতার পথের অগ্রগতীকে ত্বরান্বীত করেছে বলা যায়, বিষয়টি ছিল মতি দ্বারা লিখিত ক্রিকেট বিষয়ক একটি প্রতিবাদ পত্র। ক্রীড়া সাংবাদিকের সাংবাদিকতার নিরিখে মতি নন্দী একনম্বরে রেখেছিলেন বেরি সর্বাধিকারীকে, সাংবাদিকতার ধরণ অত্যন্ত রুচিমান হওয়া সত্ত্বেও কোন পত্রিকার খেলার পাতা নিয়মিত বেরির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো না, অথচ ভারতীয় ক্রীড়া জগতের উপরমহলে তার ছিল অগাধ যাতায়াত, খেলার মাঠের দুর্ঘটনার বিবরণ যেমন মতিকে ক্রীড়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্র প্রস্তুতি তে সাহায্য করেছিল, তেমনি সাংবাদিকতার জগতে পরিচিতিদানে বিশেষ সহায়তা করেছে,'বডি লাইন সিরিজে সিডনিতে প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করেও পতৌদির নবাব, মনসুর আলীর বাবা ইফতিকার আলি পরের টেস্টে বাদ পড়েছিলেন।'[৪] অনৈতিক বাদ পড়ার ঘটনায় সত্যবিবরণীতে পূর্ণ জ্যাক ফিঙ্গলটনের'ক্রিকেট ক্রাইসিস' নামক অসাধারণ বই এর বডিলাইন সিরিজের প্রতিবেদনটি মতি নন্দীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি গর্জে উঠেছিলেন, প্রতিবাদপত্রের প্রতিউত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন বেরি সর্বাধিকারী। 'কিন্তু এক্ষেত্রে জবাব দিতে বাধ্য হচ্ছেন। কেননা, এই ঘটনাটা তাকে ইফতিকার আলি পতৌদি নিজের মুখে বলেছিলেন দিল্লির রোশানারা ক্লাবে।'[৫] ক্রীড়াসাংবাদিকতার প্রথম পর্যায়ের সাফল্য আকর্ষিত করেছিল সন্তোষকুমার ঘোষকে সে কথা নিজেই প্রকাশ করেছিলেন মতি নন্দী, স্মৃতিচারণার কালে সাহিত্যের পাশাপাশি, ক্রিকেটও যে তার আয়ত্তের মধ্যে তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি সন্তোষবাবুর। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা মতিকে বাস্তবতার আলোর অগোচরকে দেখতে সাহায্য করেছিল। সেই দেখা শুধু নিজমনে আবদ্ধ না রেখে সাহিত্যের ভাষায় পাঠকমহলে প্রকাশ করতে পারার দরুন সৃষ্টি করতে পেরেছেন 'বারান্দা', 'সাদাখাম' এর মতো উপন্যাস।

অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আয়ত্ত করতে পেরেছেন মাঠের লেখা, খেলার ধরণ, খেলার জগৎ ও খেলোয়াড়ের মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তনকে। 'সারথির সারথি', 'দলবদলের আগে', 'দ্বাদশ ব্যক্তি' রা তার সাক্ষ্য বহন করে।

একথা আমাদের মেনে নিতেই হয়, ভারতবর্ষে খেলাধুলার পরিধি খুবই সীমিত। খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে প্রয়োজনীয় উন্মাদনার বড়ই অভাব। খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিপরীতে অবস্থান করে পাশ্চাত্যের দেশগুলি। কারণ সেখানে ক্রীড়াকেন্দ্রিক পেশাদারি প্রথা চালু রয়েছে। পেশাদারি প্রথার দরুণ রয়েছে সংঘর্ষ, ভীতি, উত্থান, পতন সংক্রান্ত বিষয়গুলি, যে বিষয়গুলি রয়েছে আমাদের দেশে পঠন পাঠন কে কেন্দ্র করে,তাই শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে যতখানি আগ্রহ এদেশীয়দের, ততোবেশি উদাসীনতা ক্রীড়াকে কেন্দ্র করে, প্রধানতম কারণ প্রতিষ্ঠানীতিকতার অভাব তো বটেই সঙ্গে কৃষিপ্রধান এ দেশে রুজি রোজগারের রোজনামচায় হিমসিম খাওয়া প্রাণ যতবেশি আগ্রহী ভাত ডালে, ততোবেশি অগ্রাহ্যতা লক্ষণীয় স্বাস্থ্যসচেতনতায় সাহিত্য সমাজের দর্পণ, সমাজের বিষয়টাকে গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে গ্রহনীয় উপাদান স্থান পায় সাহিত্যে। সে দেশের সমাজে খেলার প্রাধান্য থাকায় সাহিত্যে দর্শিত হয় অনায়াসেই খেলা ও খেলোয়াড় জীবন। সেখানে খেলাজগত শুধু আকর্ষিত হয়ে ওঠে না সাহিত্যের পাতায়, চমক জাগায় না। খেলার মাঠে, পর্যটক আকর্ষণের জন্য সে দেশে ব্রাজিল শুধু পেলেকে উপজীব্য করেই প্রদর্শনী খোলেন। 'কার্ডস বলেন, উইলফ্রেড রোডস ইংল্যান্ডের জাতীয় সম্পদ, হোমিংওয়ে ব্রকারক্টে নায়ক করে 'ফিফটি গ্র্যান্ড' এর মতো অসাধারণ গল্প লেখেন। লিস্টন প্যাটারসন লড়াইয়ের বিবরণ নিউইর্য়ক টাইমসে এ লিখতে রাজি হন, ট্রম্যাণ ক্যাপোট; বেসবল গল্পের ভাষা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন শ্রীমতি ভার্জিনিয়া উলফ, লোভ সামলাতে না পেরে টমাস মাণও ফেলিক্র ক্রুলকে দিয়ে টেনিস খেলান। বক্রায় সেরদার মৃত্যুতে অতুলনীয় লিখেছিলেন ফঁকতো, ফুটবল খেলার স্বীকারোক্তি দিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন ফ্যামু।

ভারতবর্ষে খেলাধুলার পরিধি  সীমাবদ্ধ জগতে ঘোরাফেরা করার দরুন, তাকে সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরার আগ্রহও গুটিকতকের। সে আগ্রহে প্রাধান্য পায় গল্পের কাহিনী। বাঙালি লেখকদের খেলা ও খেলোয়াড় কেন্দ্রিক প্রত্যক্ষ দর্শণ বা অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের অভাব হেতু খেলাকে সাহিত্যভুক্ত করার মতো আগ্রহ লক্ষিত হয় না সাহিত্যিক মহলে। প্রত্যক্ষ সংযোগে না থাকার কারণে খেলোয়াড়ের মানসিকতা,তাদের মুখের ভাষা, ভাবনাচিন্তা বোঝার ক্ষমতা না থাকার ফলে খেলা ও খেলোয়াড়ের জীবন প্রাধান্য পায় না এদেশীয় সাহিত্যে।

বাংলার পাঠকমহলে মতি নন্দী নামটি মূলত পরিচিত ক্রীড়াসাহিত্যিক রূপে। প্রশ্ন জাগতেই পারে বাংল যেখানে খেলাকে নিয়ে মাতামাতি হয় না, সেখানে বাংলার প্রতিনিধি কোন একজন সাহিত্যিকের কলমে লেখা প্রাধান্য পেল কিভাবে। এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে ফিরে যেতে হবে সাহিত্যিকের প্রথম জীবনে। লেখালেখির সূত্র ধরেই ক্রীড়াসাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ ঘটেছিল মতি নন্দীর, সাহিত্যিক জগতে প্রবেশ করার বহু পূর্ব হতেই লেখা আর মাঠের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেকথা তিনি নিজেই প্রকাশ করেছেন ১৯৭৬ এ 'দেশ' পত্রিকায় 'লেখা আর মাঠ আমার কাছে জ্ঞান হওয়া থেকেই একটা ব্যাপার। এটা অবশেষে আমার জীবন হয়েছে। খেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় মানুষের দেহের গুরুত্ব,দেহ সঞ্চরণের সৌন্দর্য, পরিশ্রমদ্বারা আধীক গুনাবলীর প্রকাশ যা কখনো না কখনো শিল্প আস্বাদনের স্তরে উত্তীর্ণ হয়, এবং সমাজের নিচুতলার মধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্বের চেহারাটা কেমন, তা আমাকে দেখিয়ে ও

বুঝিয়ে দেয়। সুযোগটি আরো বেশি পেয়েছি আমার চাকুরীর জন্য। যে দেশে এখনো কুড়ি কোটিরও বেশি মানুষ অর্ধাহারে ধুকছে, শতকরা ৭০ জন লিখিতে পড়তে জানে না, সে দেশের শিল্পীর পক্ষে দেশের এই অবস্থাটা কিছুতেই এড়ানো সম্ভব নয়, অবশ্য যদি যোগাযোগ থাকে। 'স্ট্রাইকার' বা 'কোনি' এই যোগাযোগই একটা দিক।'[৬]

সাহিত্যিক দক্ষতাকে আয়ত্ত করে পরবর্তীতে ক্রীড়াসাংবাদিকতার কারণে সাহিত্যিক জগতে বিচরণের পাশাপাশি সরাসরি খেলার মাঠে যাতায়াতের সুযোগ ঘটে।ক্রীড়াসাংবাদিকতার পথকে দৃঢ়তর করতে সহায়তা করে যেমন অজস্র খেলাপ্রীতি, তেমনি সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি, সৃজনশীল মানসিকতা, মতি নন্দী তার নিজ গুনে সন্তোষকুমার ঘোষের দৃষ্টিআকর্ষণ হেতু 'আনন্দবাজার' পত্রিকা হয়ে উঠেছিল জীবনের পরম পথেয়। জীবনের অগ্রদূতবললেও ভুল বলা হবে না। সন্তোষবাবু যে সময় মতি নন্দীকে আনন্দবাজারের ক্রীড়াসাংবাদিক রূপে নিযুক্ত করেন সে সময় যেমন পত্রিকার সার্কুলেশন ক্রমশ নিম্নমুখী, তেমনি সদ্যবিবাহিত মতি জীবনও অর্থকষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে। সন্তোষবাবু যেমন মতি জীবনে আশার দিশা, তেমনি মতি নন্দীও পথ দেখিয়েছিল নতুন করে নতুন ভাবে আনন্দবাজারের ক্রীড়াকেন্দ্রিক পাতার জন্ম দিয়ে। 'মাঠ ময়দান' নাম নিয়ে নবজন্ম নিলো যে খেলামূলক অধ্যায়টি, সেই অধ্যায়ের জয়যাত্রারসঙ্গে সূচিত হলো মতি জীবনের ক্রীড়াসাংবাদিকতার সফল যাত্রা।

ক্রীড়াসাংবাদিকতার সূত্র ধরে মতি নন্দীর রচনায় খেলা সাবলীলরূপে প্রকাশিত হয়েছে ঠিকই, তবে তার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ক্রীড়ামূলক সাহিত্য যে রচিত হয়নি তা কিন্তু নয়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্রীড়া উপন্যাসে এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ক্রীড়াবিষয়ক ছোটগল্প কিংবা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ক্রিকেট সাহিত্যের বিবিধ প্রসঙ্গের উত্থপন ঘটেছে, এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যিকদের কলমে ক্রীড়াসাহিত্য রচনার দিকটিও প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হয়েছে। মতি সাহিত্যে সমস্যা এসেছে জীবনের পরিপূরক রূপে, সে জীবন হোক সংসারের চৌহদ্দীময় বা খেলাজীবন, প্রত্যেকটি সমস্যাকে তিনি ধরতে চেয়েছেন একেবারে গোড়ায় গিয়ে। বাস্তব জীবনের সমস্যাকে অন্বেষণ করতে পারার দরুণ সমস্যার রূপকে চিহ্নিত করে তাকে সমৃদ্ধ উৎপাটন করতে সক্ষম হয়েছেন তাই মুক্তির আকাশকে ছুঁতে পেরেছে 'নক্ষত্রের রাত' এ দিনেশ মাধবী ও তার পরিবার,'সাদা খাম' এর প্রিয়ব্রত রা। খেলাময় জীবনের সমস্যা তো রয়েছে, সেই সঙ্গে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ক্রীড়াসাহিত্যের সঙ্কটময় রূপটিকেও দেখতে ও পরবর্তীতে সাহিত্যের ভাষায় পাঠকমহলে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। সাহিত্যিকের যে কোন সাহিত্যের বিষয়ভাবনায় প্রাধান্য পায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জীবনদর্শন বা অভিজ্ঞতা। বাংলা লেখার বিষয়ে প্রাধান্য না থাকার কারণে, খেলা বা খেলোয়াড়ের সঙ্গে বাঙালি লেখকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাব, তৎকেন্দ্রিক চিন্তা চেতনার সেতুবন্ধন গড়ে না ওঠায় ক্রীড়াসাহিত্যের গতিকে রুদ্ধ করেছে বলে মতি নন্দী অভিমত প্রকাশ করেছেন। অভিমত ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত নন সাহিত্যিক, তার প্রতিফলন লক্ষিত হয় ক্রীড়াকেন্দ্রিক রচনার ছত্রে ছত্রে। খেলার মাঠের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ যে এই প্রতিফলনের সহায়ক তা বলার অপেক্ষায রাখে না। সাহিত্যের জীবন মুখরিত হয়ে ওঠে মূলত চরিত্রের গুনে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে মুখের ভাষায়,মতি নন্দী বাস্তব চরিত্রকে, জীবনকে কাছ থেকে দেখে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন বলেই মাঠের জীবনও পরিবারের জীবনকে এক করেছেন। সমস্যাকে নিয়ে এসেছেন তাদের মতো করে তাদেরই ভাষায়। ব্যক্তিগত জীবনের পাতা উল্টালে দেখা যাবে ক্লাস সেভেন থেকে সাহিত্যিকের গড়ের মাঠে যাতায়াত; শৈলেন মান্নার ফ্রি কিক দেখে বেড়ে ওঠা। ছেলেবেলা থেকেই অভ্যস্ত হার্টস্টাফ এবং

কম্পটন দুই জনপ্রিয় ক্রিকেটারের নামের সঙ্গে, ইডেনে বিনা টিকিটে খেলা দেখার মুহূর্ত থেকে ১৯৪৮ এ ইডেনে টিকিট কেটে টেস্ট ম্যাচ দেখার অভিজ্ঞতা সবই তার সংরক্ষণে। খেলোয়াড়ের খেলা দেখেই যে তিনি খেলার মাঠ থেকে ফিরতেন না স্কোরবোর্ডের ওপরও নিছক দৃষ্টিনিক্ষেপের পরিবর্তে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণী মনোভাব যে কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করেছে বহুবছর পরে জলন্ত স্মৃতিচারণা তার সাক্ষ্য দেয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ এই বিশ্লেষণী মনোভাব বড়বেশি কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করেছে সাংবাদিকতার সূত্রধরে। ইডেনে টিকিট কেটে খেলা দেখার কালে ইডেনে খেলার স্কোর পরিমাপ করা হতো স্কোরবোর্ডের নিরিখে, স্কোরবোর্ডের নিরিখে স্কোরের হিসেব রাখা এ আবার নতুন কি বিষয়? অভিনবত্বটা এখানেই, সে সময় উচু কাঠের স্কোরবোর্ড ছিল, বোর্ড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্কোর বদলানো হত, এবং স্কোরবোর্ডের নিচে একটা ছোট্ট ট্রেউল মেশিন থাকত, যা স্কোর ছাপার সহায়ক। সাংবাদিক জীবনের প্রথম দিকে তিনি একটি স্কোরবোর্ড কেনেন, এবং তাতে কে আউট হচ্ছে, কত রান করার পর আউট হচ্ছে সমস্ত কিছুই লিখে রাখতেন, পরবর্তীতে তিনি স্কোরবোর্ডের পরিবর্তে নোটবুকে বন্দী করতেন রানের পরিমাপ,স্কোর নথিভূক্ত করতো তার হাতের পেন দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হতো বিরাট ঘন্টার আওয়াজে দর্শকের নড়ে চড়ে বসা। ইডেনজুড়ে মানুষের ভালোলাগা, উত্তেজনা রোমাঞ্চের দৃশ্য, সাংবাদিকতার কারণে তিনি যে খেলার মাঠে সমস্ত কিছুকে আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তেমনটি কিন্তু নয়, শৈশব থেকেই আর পাঁচটা ভালো অভ্যাসের মতোই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন খেলার মাঠের চারপাশকে দেখতে, তাই কলাবতীর চোখ দিয়ে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন খেলার মাঠের গরমিল, স্কোরবোর্ড ঘিরে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য "খেলা দেখতে দেখতে কলাবতীর আটঘরা বাগদিঘি ক্রিকেট ম্যাচের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। গ্রামের ক্রিকেট আর কলকাতার ক্রিকেট তার কাছে যেন সমান মনে হল, তার থেকেও যেটা বেশি করে অনুভব করল, এইরকম গড়াপেটা করে খেলে যারই লাভ হোক, ক্ষতিটা হচ্ছে বাংলার। ময়দানে যে এইভাবে ক্রিকেট খেলা হয় এটা সেই জানতো না।" [৭]

জীবনে দেখা প্রথম টেস্ট ম্যাচের স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে রচনা করেছেন 'ক্যাম্পার' নামক গল্পটি। ১৯৪৮ সালে তিনি হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদকে দেখেন মোহনবাগান মাঠে, খেলতে দেখেন প্রথম ও শেষবারের মতো। খেলার মাঠের স্মৃতিকে অক্ষুন্ন করে রাখতে পারার দরুণ কলকাতার ময়দানের প্রায় হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছেন তার রচনায়। উত্তর কলকাতার বুকে সেইসময় গজিয়ে ওঠা অগাধ খেলার ছোট ছোট মাঠ। সেই মাঠের খেলাকে ঘিরে জনগণের সমাগমের উজ্জ্বল স্মৃতি মুখরিত হয়ে ওঠে 'সারথির সারথী' র জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের ভাবনায় 'তখন এরকম দোকানগুলো ছিল না, মাঠের ধারের বাড়িগুলোও নয়। একটি দোতলা বাড়ি আড়াল করে দিয়েছে বিপিন স্যারের কাঠ আর ছিটেবাঁশের দেওয়াল দেওয়া টালির চালের ঘরটাকে। ঘরের জানালা দিয়ে তিনি মাঠের ছেলেদের খেলা দেখতে পেতেন'।[৮]

ব্যক্তি মতি বছর তিন চার ধরে ক্রিকেট খেলা এবং গল্প লেখা প্রায় সমান্তরাল গতিতে চালিয়ে গেছেন। দিনের পর দিন বছরের পর বছর গল্প লেখার অনুশীলন চালিয়ে গেছেন নিরবিচ্ছিন্ন গতিতে। তেমনি খেলার মাঠের আনাচেকানাচে দেখতে সমর্থ হয়েছেন, দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে। প্রেক্ষাপটকে আত্মস্থও করতে পারার দরুণ তা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষে ক্রীড়াসংস্কৃতি যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি তার অন্যতম কারণ ভাত-ডালে আবদ্ধ অভাব অনটনের সংসারে প্রকৃত ক্রীড়াপ্রতিভা হারিয়ে যায় দারিদ্র্যতাকে সঙ্গী করে। খেপ খেলার মারাত্মক কুফলের দিককে তুলে ধরেছেন সাহিত্যিক 'নক্ষত্রের রাত', 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান', সারথির সারথি' তে। ক্লাবকেন্দ্রিক খেলার সীমাবদ্ধতাকে খুব কাছ থেকে

দেখতে পেরেছিলেন বলেই সৃষ্টি করতে পেরেছেন জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের মতো ক্রীড়াপ্রতিভার মনযন্ত্রণাকে, 'এখন তার মনে হচ্ছে, একমাত্র টাকা পাওয়া ছাড়া ফুটবল থেকে সে কিছুই পায়নি। নিজেকে তার পরিপূর্ণ ভরাট মনে হচ্ছে না'। [৯] ক্রীড়াসাংবাদিকতার সূত্র ধরে তিনি দেখতে সমর্থ হয়েছেন নিজ দলের প্রতিভাবান খেলোয়াড় প্রতি সেইদলের অন্যান্য খেলোয়াড় সদস্য,দলের পরিচালক মন্ডলির অসহিষ্ণুতা, যা চিহ্নিত হয়েছে 'সারথির সারথি', দলবদলের আগের প্রসঙ্গে, সাংবাদিকার সূত্র দেখেছেন ক্রীড়াজগতের অন্দরমহলকে, জিজ্ঞাসুচোখে সন্ধান করেছেন সাধারণ জীবনের অগোচরে থেকে যাওয়া জীবনকে। সন্ধানু চোখের ভাষায় প্রিয়ব্রতরা মুক্তি পাই, ফাইট করতে শেখে জ্যোতির্ময়, সমীরণ ও কোনিরা। ভবিষ্যত প্রজন্মের পথ দেখাতে মরিয়া হয়ে ওঠে তপতী দেবীর মতো মায়েরা।

'মাঠ ময়দান'এর পাতাকে আরো বেশি বৈচিত্র্যময় করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন সহকারী হিসাবে চিরঞ্জীবকে পেয়ে। তপন ঘোষ ও রূপক সাহার মতো তরুণ সাংবাদিকরা ভুবনেশ্বর পাণ্ডে, অমল দত্ত, প্রশান্ত ভট্টাচার্যের মতো খেলোয়াড়ারেরা তাঁর সম্পাদনায় 'মাঠ ময়দান' হয়ে কলম ধরেছেন। মতি নন্দী নিপুন সম্পাদনায় এদের লেখাকে একসূত্রে গেঁথে এক নতুন ধারার সূচনা করলেন সাংবাদিকতার জগতে বাংলা ভাষায়, এই সত্যতা আজ ইতিহাস স্বীকৃত। মতি পূর্বে ক্রীড়াসাংবাদিকতা ছিল সাবেকি রীতির। এই ঘরনাকে প্রায় অপরিবর্তীত রেখেছিলেন অজয় বসু, মুকুল দত্তের মতো প্রবীণ সাংবাদিকেরা। প্রচলিত ধারাতে পরিবর্তন এলো মতি নন্দীর হাত ধরে। তফাত লক্ষিত হয় মূলত নতুন ধরণের গদ্যে। তরুণ সাংবাদিকদের তিনি পরামর্শ দিতেন ফিচার লেখার বিষয়ে। পরামর্শের উদ্দেশ্য ভাষা যাতে সহজ, সরল, সাবলিল হয়। ভাষা বুঝতে যাতে গ্রাম-মফস্বল-শহরের মানুষদের অসুবিধা না হয়। তাঁর সম্পাদনায় অনেকসময় লেখাগুলি গল্পের মতো নিটোল হয়ে উঠত। ক্রীড়াসাংবাদিকতায় স্বাদবদল ঘটাতে মতি নন্দী খেলা আর সাহিত্যকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসেছেন। নেভিল কার্ডাসের রচনার ছাপ যে তার রচনায় রয়েছে তা অস্বীকারের জায়গা নেই, তবু পরিবেশের তফাৎ মতি নন্দীর সংবাদভাষ্যকে অনন্য করে তুলেছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রথম ক্রীড়াসম্পাদকরূপে তিনি যখন নিযুক্ত হন সেই সময়ে দাঁড়িয়ে তা ক্রীড়াসাংবাদিকতার জগতে বিশেষ আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। ভবানীপুর টেন্ট তীব্র সমালোচনায় সেদিন মুখরিত হয়ে ওঠে যে, একজন সাহিত্যিক কিভাবে ক্রীড়াসম্পাদনার দায়িত্ব নিতে পারে, তা 'আনন্দবাজার' পত্রিকার কর্তৃপক্ষেরও অজানা ছিল না, ঘরে বাইরে এক প্রবল চাপ মতির মনোভূমির ক্ষেত্রকে আরো মজবুতীতে সেদিন সহায়তা করে, এক এক প্রতিবন্ধকতাকে তিনি অনায়াসেই অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন বুদ্ধি, পরিশ্রম আর একনিষ্ঠতার জোরে। চাকরী স্থায়ী হবার পর প্রথম অ্যাসাইমেণ্ট ছিল তার ভারত বনাম রোমানিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় যে ডেভিস কাপের ম্যাচগুলি। বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে তিনিই প্রথম ডেভিস কাপের ম্যাচগুলি কভার করেছিলেন বাংলার বাইরে গিয়ে। আত্মবিশ্বাসের পাখায় ভর করে না জানা টেনিস খেলাটাকেও বুঝতে চেয়েছেন চেনা-জানা খেলা মারফত। টেনিস খেলা কভার করতে করতে গুরুত্ব দিয়েছেন পর্যবেক্ষণে, লেখার সময়ে বর্ণনার প্রাধান্য লক্ষিত। কারণ টেনিসে টেকনিক্যালি জ্ঞান না থাকায় মুহূর্তটাকে গল্পের ছলে তুলে ধরা ছাড়া সেই সময় কোন উপায় ছিল না। ঘটনাচক্রে সেই ধরণটাই পাঠকের ভালো লেগে যায়। সেই সময় ম্যাচ শুরুর আগে নন প্লেয়িং ক্যাপ্টেন রামনাথন কৃষ্ণণ-এর নিকট একটা ইনটারভিউও নিয়েছিলেন। মতি আমলে বিশেষ খেলার জন্য একজন বিশেষ রিপোর্টারের চল তখনও ছিল না। এমনও হয়েছে সাংবাদিক মতিকে দিল্লিতে দলীপ ট্রফির ম্যাচ কভার করে আবার মাদ্রাজে চলে যেতে হয়েছে জাতীয় সাঁতার চাম্পিয়ানশিপের রিপোর্ট তৈরি করার জন্য। ১৯৭২ এই বাংলা-

বিহার এর মধ্যে রঞ্জি ট্রফিরম্যাচ হয়েছিল ধানবাদের কাছে, সেখানে একমাত্র সাংবাদিক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মতি নন্দী।

ক্রীড়াসাংবাদিকতার জগতে পরিবর্তন আসতে শুরু করে ১৯৭০ সাল থেকে, যে সময় মতি নন্দীও সাংবাদিকতার জগতে বিরাজমান সত্ত্বা। এর পূর্বে 'ফ্রিল্যান্সার' বেরি সর্বাধিকারী ব্যতীত আর অন্য কোন সাংবাদিক বাংলা কাগজের পক্ষ নিয়ে কলকাতার বাইরে ম্যাচ কভার করতে যাননি। ১৯৭২ এর ডিসেম্বর মাস নাগাদ ভারতের সঙ্গে টনি লুইসের ইংল্যাণ্ড দলের প্রথম টেষ্ট ম্যাচের প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য মতি নন্দী প্রেস পাস নিতে গিয়েছিলেন ফিরোজ শাহ কোটলার ডিভিসিএ অফিসে। সেখানে তাকে এমন ধরণের ও প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল যে, তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' থেকে এসেছেন কিনা। মুম্বাই এর ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামেও এই রকমেরই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। ইংরেজি হরফে রোমান পদ্ধতিতে সেই সময় বাংলার খেলার খবরের রিপোর্ট পাঠাতে হত, এই পদ্ধতিতে ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে রাখা ডাকবিভাগের টেলের যন্ত্র থেকে তিনি কলকাতার অফিসে রির্পোট পাঠাতেন। এই ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে কলকাতার অফিসে সরাসরি খবর পাঠানোর ক্ষেত্রে সময়ের সাশ্রয় হলেও বাংলা হরফে লেখার স্বাধীনতা আর থাকল না। সাত-আট ঘণ্টা ধরে ক্রিকেট দেখার পর অস্বাচ্ছন্দ রোমান হরফে লিখতে গিয়ে প্রায় ক্ষেত্রে লেখার ভাষা যেন কুঁকড়ে গেল। গোটা কর্মজীবনই এরকম নানা ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। নানারকম অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়েছিল মতি নন্দীকে পাঠকের কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য। ১৯৭৮ এ ক্রীড়াসাংবাদিকতায় মতি নন্দী এক অভিনবত্ব নিয়ে আসেন, অবিনবত্ব আসে মূলত টেস্ট ম্যাচে যে খেলোয়াড়টি খেলছেন তাকে দিয়েই ম্যাচের রিপোর্ট লেখানোর মধ্য দিয়ে। ইডেন টেস্ট ভারতীয় দলের অধিনায়ক সুনীল গাওস্কারকে দিয়ে তিনি ম্যাচ রিপোর্ট লেখানো শুরু করেন, ১৯৮০-র ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের 'জুবিলি টেস্টে'র ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন বিশ্বনাথ। উক্ত টেস্টে বব টেলরের ব্যাট করা কালিন কপিলের বলে ক্যাচ ধরার আবেদন জোরালো হতে থাকে উইকেটকিপার সৈয়দ কিরমানি মারফত। আম্পায়ার হনুমন্তরাও কর্তৃক টেলর আউট বলে ঘোষিত হলে টেলর ফিরে যাচ্ছিলেন, টেলর যে আউট নয়, বল যে ব্যাটে লাগেনি এই সত্যটি প্রকাশ করেন স্লিপে থাকা বিশ্বনাথ অ্যাম্পায়ারের কাছে গিয়ে, বিশ্বনাথের টেলরকে ডেকে আনা, কোন কিছুই নজর এড়াইনি প্রেস বক্সে থাকা মতির। বিশ্বনাথ যে বড় মাপের মানুষ এই সত্যটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন মতি নন্দী। তিনি সারাজীবন খুঁজে গেছেন এমন বড়ো মাপের মানুষকে এবং তাদেরই তিনি তার সাহিত্যে নায়ক করে নিয়ে এসেছেন। পাঠকের তরফ থেকে এই নায়কের ব্যর্থতায় তার কলম গর্জে উঠেছে। ১৯৮৩-তে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে ভারতের খেলায় ভারতের অক্ষম আত্মসমর্পণে তিনি গর্জে উঠেছেন, লিখেছেন 'দোহাই এদের ক্লীব বলবেন না। এদের অনেকেই সন্তানের জনক' বা 'ওরা নিয়ে এল সাড়ে তিন টন লজ্জা'র মতো রচনাগুলি।

যে ক্রিকেটের আদর্শে মতি নন্দী সারাজীবন বিশ্বাসী ছিলেন তাকে আর তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি বুঝতে পারছিলেন ক্রিকেট ধীরে ধীরে পণ্যে পরিণত হচ্ছে। ক্রিকেটাররা অর্থের লোভে ক্রমশ চলে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে, টেলিভিশন- এর দৌলতে খেলা টিভিতে চলে আসায়, পরের দিন সেই খেলার খবর সংবাদপত্রের পাতায় দেখার আগ্রহ ক্রমশ কমে আসতে থাকে পাঠক মনে। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা খেলার খবরকে রঙিনভাবে পরিবেশিত করার মানসিকতায় ড্রেসিংরুমের ভেতরের খবরকে প্রকাশ্যে আনতে শুরু করেন। খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত জীবনকে কে কতভাবে খবরের পাতায় নিয়ে আসতে পারে সে নিয়ে এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। মতি নন্দী মানিয়ে নিতে পারেন নি। সময়ের

চাপে, সময়ের দাবিতে ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন ক্রীড়াসাংবাদিক। মতি সৃষ্ট ঘরানা যেন ক্রমশ পরাজিত হতে থাকে, মতি নন্দী দূরদর্শীতা বলেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন ক্রিকেটের সমূহ সর্বনাশকে।

শুধু ক্রিকেট নয়, বাংলা ফুটবলেরও ভরাডুবি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, ময়দানি সংস্কৃতির নেতিবাচকতায় তিনি সোচ্চার হয়েছেন বারবার, ফুটবলারদের নৈতিক অধঃপতন বা ক্রীড়া কৌশলের দৈন্যদশা তাঁর কলমে সমালোচিত যেমন হয়েছে, তেমনি মাঠের ভেতরের পারফরম্যান্স বা মাঠের বাইরে খেলোয়াড়দের আচরনের তারিফে তাকে কখনই কার্পণ্য করতে দেখা যায় না।

শুধু ফুটবলারাই নয়, মতি কলমে বাংলা ফুটবলের যে ছবি ধরা পড়েছে সেখানে বিশেষ স্থান দখল করে ছিল দর্শক মহল। তাঁর তৈরি ম্যাচ রিপোর্টে কেবলমাত্র মাঠের ভেতর বাইশজনের দাপাদাপিই লক্ষিত হত তেমনটা কিন্তু নয়, সেখানে মাঠে উপস্থিত নানা দর্শকের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার রূপও ধরা পড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বড়ো ম্যাচের রিপোর্ট এর কথা এখানে উত্থাপন করা যেতে পারে। "তাঁবুর পাশের সরু পথটা দিয়ে ওরা বেরিয়ে আসছে। থমথমে বিষণ্ণ মুখ। অবসন্ন দেহগুলিকে টেনে নিয়ে চলছে ক্লান্ত চরণ। তারা পরস্পরের দিকে তাকাতেও ভয় পাচ্ছে, কেননা তাহলেই পাশের জন প্রশ্ন করবে এবং সে প্রশ্ন তারও কেন এমন হল? বৃষ্টি ভেজা সপসপে পোশাক, পা ভর্তি কাদা, শূন্য চাহনি নিয়ে ওরা তাঁবুটার দিকে অভ্যাস বশে একবার তাকিয়েই আবার চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। সামনের লোকের পিঠে হাতের চাপ দিয়ে অস্ফুটে কেউ বললঃ দেখে চলুন সামনে গর্ত। সামনের লোকটা চমকে উঠল। একটি কিশোর বৃষ্টির মধ্যে বোবা আর্তনাদে গোঙিয়ে যাচ্ছে মাটিতে পা ছড়িয়ে। ওরা তার দিকে তাকাচ্ছে না, নীরবে এগিয়ে গিয়ে চলছে গেটের দিকে পরস্পরের গায়ে গা এলিয়ে এবং কারোর দিকে না তাকিয়ে। ছেলেটির গোঙানি, বন্ধ তাঁবুর দরজা, জনহীন ক্লাব লনের একধারে কয়েকটি পুলিশ এইসব শব্দ বা দৃশ্য তাদের অসাড় অনুভূতিতে আঁচড় কাটছে না, ওরা চলেছে মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তনের নেপোলিয়ানের লাঞ্ছিত বাহিনীর মতো, ছিন্নভিন্ন হৃদয় নিয়ে। মোহনবাগান জিতবে ধরে নিয়েই ওরা এসেছিল জয় দেখতে। ওরা ফিরে চলে যাবে বিমূঢ় ২-০ পরাজয়ের বোঝা কাঁধে।" [১০] ১৯৭৭ সালের ৯ জুলাই 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' মতি নন্দী এই লেখাটি লিখেছিলেন। উদ্ধৃতাংশটি পড়লে ম্যাচ রিপোর্টের অংশবিশেষ বলে মনে হবে না। মনে হবে এ যেন কোন উপন্যাস বা গল্পের অংশ। এই জায়গা থেকেই মতি নন্দীর কলমের প্রসংসা না করে পারা যায় না।

এইভাবেই এক শতাব্দী থেকে আর এক শতাব্দী ধরে মতির কলম ছুটে চলেছে। ফুটবল সংস্কৃতিতে উড়েছে বিশ্বকাপের ধ্বজা ইতিমধ্যেই। ক্লাব ফুটবল থেকে ও বাংলার সামগ্রিক ফুটবলের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি অনেক বেশি চিন্তিত ছিলেন এবং সক্ষম হয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবলের সংকট ও অবক্ষয়কে চিহ্নিত করতে। তিনি খুশি হতে চেয়েছিলেন ঘরের ছেলের সাফল্যে, জীবন সায়হ্নে এসে তাই লিখেছেন- "জন্মসূত্রে আমি ঘটি। চিডি যখন চতুর্থ গোলটি দিল তখন আমি চেয়ার থেকে আধফুট উঠে পড়েছিলাম বিস্মিত হয়ে। আমি এটা নিশ্চিত জানি চিডি না হয়ে যদি ওই খেলোয়াড়টির নাম চণ্ডীচরণ নন্দী হত তাহলে তিন ফুট লাফিয়ে উঠতাম...।"[১১] বাঙালী ফুটবলারের সাফল্যে খুশি হয়ে তিন ফুট লাফানোর আকাঙ্খা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে মতি নন্দীকে। থেমে গেছে মতি কলম, কিন্তু তার অতৃপ্ত বাসনার নিরসন ঘটেছে, বলা ভালো তিনি নিরসন ঘটিয়েছেন তার ক্রীড়া উপন্যাসগুলিতে, যেখনে ঘরের ছেলেরা

অসীম কষ্ট সহ্য করেও স্বপ্ন দেখে, আকাঙ্খা চরিতার্থ করার পথ খোঁজে, তাই প্রসূন, কমল, কোনি, শিবারা জয়ী হয়, সেইসঙ্গে সাংবাদিকের ক্রীড়াসাহিত্যগুলি পেয়ে যায় 'আধুনিক রূপকথা'র তকমা।

**তথ্যসূত্র:**

১.চক্রবর্তী মানস,'মতি নন্দী',দীপ প্রকাশন,২০৯ এ বিধান সরণি, কলকাতা -৭০০০০৬ পৃ:১৬৯
২.ঐ পৃ:১৬৯
৩ .ঐ পৃ:১৭২
৪.রায় পারমিতা,'ক্রীড়াসাহিত্য : বাংলা সাহিত্যের এক অনালোচিত ধারা' (অপ্রকাশিত), বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা,২০১৭ পৃ:১৭৬
৫.ঐ পৃ:১৭৭
৬.চক্রবর্তী মানস,'মতি নন্দী',দীপ প্রকাশন,২০৯ এ বিধান সরণি, কলকাতা -৭০০০০৬
৭.নন্দী মতি,'কিশোর সাহিত্য সমগ্র'(প্রথম খন্ড), পাবলিশিং প্লাস,২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬ পৃ:৪৩২
৮.ঐ,পৃ:৬৩৮
৯.ঐ,পৃ:৬৪৫
১০.চক্রবর্তী মানস,'নন্দী মতি',দীপ প্রকাশন,২০৯ এ বিধান সরণি, কলকাতা -৭০০০০৬পৃ:৭৯
১১.ঐ পৃ:৮৩

**গ্রন্থপঞ্জি:**

**আকরগ্রন্থ:**

১) নন্দী মতি, 'উপন্যাস সমগ্র' (১ম খন্ড) দীপ প্রকাশন, ১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।
২) নন্দী মতি, 'কিশোর সাহিত্য সমগ্র' (১ম খন্ড) পাবলিশিং প্লাস, ২০৬ বিধান সরণি কলকাতা।
৩) নন্দী মতি, 'কিশোর সাহিত্য সমগ্র' (দ্বিতীয় খন্ড) পাবলিশিং প্লাস, ২০৬ বিধান সরণি কলকাতা।
৪) নন্দী মতি, 'উপন্যাস সমগ্র' (২য় খন্ড) দীপ প্রকাশন, ১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।
৫) নন্দী মতি, 'উপন্যাস সমগ্র' (৩য় খন্ড) দীপ প্রকাশন, ১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।
৬) নন্দী মতি, 'হারানো মতি', (নন্দী মতি রচিত অগ্রন্থিত ও দুর্লভ উপন্যাস নিবন্ধের সংলগ্ন দীপ প্রকাশন ১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।

**সহায়ক গ্রন্থ:**

১) বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসূন, 'ফুটবল ঘরানাঃ বিল্পব ও বিবর্তন', কলকাতাঃ প্রতিভাস, ১৯৯০।
২) বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসূন, 'কবিতা সংগ্রহ', কলকাতাঃ ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ২০০৩।
৩) গঙ্গোপাধ্যায় পবিত্র, 'চলমান জীবন' (দুই খণ্ড একত্রে), কলকাতাঃ প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড ১৯৯৪।
৪) ঘোষ বিনয়, 'সাময়িক পত্রে বাংলা সমাজ চিত্র', তৃতীয় খণ্ড, কলকাতাঃ বীক্ষণ, ১৯৬৪।
৫) চক্রবর্তী মানস (স.), 'মতি নন্দী', কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন, ২০১৬।

৬) আচার্য রাজেন্দ্রলাল, 'বাঙ্গালীর বল অথবা বাঙালী জাতির সামরিক ইতিহাস', কলকাতাঃ স্টুডেন্টস লাইব্রেরি, প্রথম প্রকাশ ১৩২৮, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত) ১৩৪৫।

৭) গুহ রামচন্দ্র, 'গাঁধী- উত্তর ভারতবর্ষ' (অনুবাদঃ আশীষ লাহিড়ী, কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড), নভেম্বর ২০১২।

৮) কুমার শিবরাম (স.), 'মোহনবাগান অমনিবাস', কলকাতাঃ প্রভাবতী প্রকাশনী, ১৩৮৩।

৯) গোস্বামী হিমানিশ, 'মজার খেলা দাবা', কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৯৭, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৮।

১০) কুমার শিবরাম (স.), 'সোনার ফ্রেমে মোহনবাগান ১৯১১', কলকাতাঃ প্রভাবতী প্রকাশনী, ২০০৭।